গল্পের যাদুকরী লীলা মজুমদার

প্রসাদরঞ্জন রায়

অতি দীর্ঘ জীবন কাটিয়ে গত ৫ই এপ্রিল আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন লীলা মজুমদার। সম্পর্কে তিনি আমার মেজপিসিমা, খুবই কাছের মানুষ। আর বাংলা শিশুসাহিত্যে তিনি পরিচিত উপেন্দ্রকিশোর - সুকুমারের ঘরানার যোগ্য উত্তরাধিকারিণী হিসাবে। গত কয়েক বছর অসুস্থতা তাঁকে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তাঁর ৯৯ বছরের জন্মদিনকে ঘিরে আর তারপর তাঁর প্রয়াণের পর তাঁকে নিয়ে বিস্তর লেখালিখি হয়েছে।

এখানে তাঁর জীবনকালের একটা ছোট্ট বর্ণনা দিয়েই চলে যাব তাঁর সাহিত্যজীবনে। অন্যত্র বিশদ করে তাঁর জীবনী লিখেছি, এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

তাঁর জন্ম বিখ্যাত রায় পরিবারে ১৯০৮ সালে ২৬শে ফেব্রুয়ারি। তাঁদের আদি বাস ময়মনসিংহ জেলার মসুয়া গ্রামে। সে গ্রাম চোখেও দেখেননি লীলা, কিন্তু মুখে শুনে শুনে তাকেই 'দেশ' বলে মেনে এসেছেন। তাঁর ঠাকুরদা কালীনাথ রায় ওরফে শ্যামসুন্দর মুনশি এই গ্রামেই থাকতেন। তাঁর পাঁচ পুত্র, তিন কন্যার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ পুত্র লীলার বাবা প্রমদারঞ্জন। প্রমদারঞ্জনের আবার পাঁচ পুত্র, তিন কন্যা—লীলা ছিলেন তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা ও তৃতীয় সন্তান, আমার বাবা তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তান। লীলার বাবা-জ্যাঠারা পরিচিত ছিলেন তাঁর বই জ্যাঠামশাই সারদারঞ্জন —সংস্কৃত ও গণিতের অধ্যাপক এবং বাংলায় ক্রিকেট খেলার জনক রূপে পরিচিত, মেজ জ্যাঠামশাই কামদারঞ্জন (যিনি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী নামেই পরিচিত)—সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, চিত্রকর, মুদ্রণ-বিশেষজ্ঞ ও 'সন্দেশ" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, আর ছোট জ্যাঠামশাই কুলদারঞ্জন—শিশুসাহিত্যিক, চিত্রকর ও সফল ক্রিকেটার। প্রমদারঞ্জন নিজে ছিলেন জরিপ বিশেষজ্ঞ, বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। নানা রকমের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা তাঁর তবে স্নেহপ্রবণ হলেও তিনি ছিলেন রাশভারি আর জেদি মানুষ।

৮টি সন্তান নিয়ে প্রমদারঞ্জন আর তাঁর স্ত্রী সুরমা অনেকগুলো বছর কাটিয়েছেন শিলং-এ। লীলার জীবনের প্রথম ১১ বছর কাটে এখানে। 'আর কোনোখানে' বইতে তাঁদের শিলং-বাসের স্মৃতি ধরে রাখা আছে। শিলং-এ পড়তেন লোরেটো কনভেন্টে, সেখানে ইংরাজি ছাড়া ফরাসি পড়ানো হলেও পাঠ্যসূচিতে বাংলা ছিল না। ১৯১৯ সালে তাঁর বাবা বদলি হলে তাঁরা চলে এলেন কলকাতায়। লীলার পরবর্তী পাঠ শুরু ডায়োসেশন স্কুলে। এবার তিনি বুঝলেন যে সব বিষয় ভাল ছাত্রী হলেও তিনি বাংলায় কাঁচা, বিশেষত ব্যাকরণে। অভিধানের সাহায্য নিয়ে সে দুর্বলতা খানিক কাটানোর চেষ্টা করলেন। ক্রমশ তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে এই পরিবারের বহু বিশিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যেও তিনি উজ্জ্বলতম রত্ন। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় দ্বাদশ স্থান (মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয়), আই এ পরীক্ষায় দ্বিতীয়, বি এ ও এম ও পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, জলপানি, অন্যান্য পুরস্কার, অজস্র পদক—সংক্ষেপে এই তাঁর সাফল্যে খতিয়ান।

কিন্তু পড়াশোনায় এরকম রেকর্ড সত্ত্বেও তিনি গবেষণা বা চাকরির দিকে ঝোঁকেননি, বলেছেন, 'সবাই ভেবেছিলেন হয়তো গবেষণা করব, পি আর সে হব, আমি মনে মনে জানতাম ওসব কিছুই হব না, কোনও উচ্চ পদ অলঙ্কৃত করব না। জীবনে একটি মাত্র কাজ করব, সেটি সাহিত্য'। এও বুঝেছিলেন যে ইংরাজিতে সাহিত্যচর্চা তাঁর জন্য নয়— 'ও পথে আমার পা রাখা মাটি খুঁজি নি'। সুতরাং বাংলা সাহিত্যচর্চাই ছিল তাঁর অভীষ্ট লক্ষ, কিন্তু সে পথও সহজ ছিল না। ১৯৩০ সালে এম এ পাশ করে কিছুদিন পড়িয়েছেন দার্জিলিং-এ মহারানি গার্লস স্কুলে, তারপর রবীন্দ্রনাথের ডাকে বিশ্বভারতীতে, শেষে আশুতোষ কলেজের মহিলা বিভাগে, কিন্তু বুঝেছিলেন 'ও পথ আমার নয়'। ১৯৩৩ সালে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বিয়ে করলেন ডাক্তার সুধীরকুমার মজুমদারকে।

এই বিয়ে নিয়ে ঝড় উঠল। পাত্র হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্তান বলে তাঁর গোঁড়া, জেদি বাবা বিয়েতে সম্মতি দেননি। কিন্তু লীলাও কম জেদি ছিলেন না, বাবার অমতেই নিজের পছন্দের পাত্রকে বিয়ে করলেন, অত্যন্ত আনন্দে ৫০ বছরের বিবাহিত জীবন কাটালেন। কিছুটা দুঃখের সঙ্গেই তিনি লিখেছেন, 'খালি বাবা আমাকে ত্যাগ করলেন।...শুধু ঘর থেকেই নয়, আমার জীবন থেকেই সরে পড়লেন"। পিসেমশাই কিন্তু অত্যন্ত সদাশয় মানুষ ছিলেন। আমার মার মুখে শুনেছি যেদিন ঠাকুরদা মারা যান (১৯৪৯), সেদিন আমাদের যতীন দাস রোডের বাড়ির দোতলায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন পিসেমশাই, বলেছিলেন 'মৃত্যুর পরে অভিমান রাখতে নেই'। যা হোক, সে অনেক পরের কথা। ইতিমধ্যে সংসারের সব দায়িত্ব পড়ে গেল লীলার কাঁধে। ১৯৩৪ সালে পুত্র রঞ্জনের জন্ম, ১৯৩৮ সালে কন্যা কমলার। এক বিধবা ভাগ্নিকেও আশ্রয় দিয়েছিলেন তিন কন্যাসহ। সাহিত্যচর্চার ফুরসত কোথায়?

নিজেই লিখেছেন, 'খানিকটা দায়মুক্ত না হলে মেয়েদের পক্ষে কোনো সৃজনশীল কাজ করার পথে অনেক বাধা'। সে বাধা খানিকটা কাটল ১৯৫০ -এর দশকের শেষ দিকে, ছেলে-মেয়ে বড় হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ১৯৫৩ সালে শান্তিনিকেতনে তাঁর বাড়ি তৈরি হয়, তাঁর বড় প্রিয় ছিল এই বাড়িটি। ১৯৫৬ সালে আকাশবাণীতে কাজে যোগ দেন, পদত্যাগ করেন ১৯৬৩ তে। এই সাত বছরের বেতার জীবনের বিরাট প্রভাব পড়েছিল তাঁর সাহিত্যচর্চায়, কিন্তু সরকারি নিয়ম-কানুনের নিগড় তাঁর পছন্দ ছিল না একেবারেই। ১৯৫৮ সালে মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়, ১৯৬৩ সালে ছেলে ফিরে আসে বিলেতে দাঁতের ডাক্তারির প্রশিক্ষণ নিয়ে। পরের বছর সেও সংসারি হয়। আর ১৯৬৩ সালেই তাঁর ভাষায় 'অতি তুচ্ছ কারণে' আকাশবাণীর চাকরিটা ছেড়ে দিলেন। ১৯৬১ সালে নতুন করে 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশ পেলে তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন, ১৯৬৩ রালে সত্যজিতের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনার দায়িত্বও নেন। এবার সম্পূর্ণ মন দিলেন লেখালিখিতে। ১৯৭৫ সালে পিসেমশাই অবসর নিলে পাকাপাকিভাবে শান্তিনিকেতনবাসী। আবার ১৯৮৪ সালে পিসেমশাইয়ের অসুস্থতা ও মৃত্যুর পর ফিরে এলেন কলকাতায় ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেনের বাড়িতে। তার পর থেকে সেখানেই ছিলেন, লেখালেখি করেছেন আরও ১০ বছর। কিন্তু বাংরবার অসুস্থ ও অনেকগুলি ব্যক্তিগত আঘাত তাকে ঘরবন্দি করে ফেলে। তিনি লিখেছিলেন, 'বিধাতা যতদিন রাখেন, যেন কাজ করে যেতে পারি আর যখন ডাক দেবেন, সব ছেড়েছুড়ে কলম

নামিয়ে যেন চলে যেতে পারি'। আমাদের দুর্ভাগ্য যে তাঁর ক্ষেত্রে তা ঘটেনি, দীর্ঘদিন রোগে ভুগে তিনি মুক্তি পেলেন এ বছরের ৫ই এপ্রিল।

এবার তাঁর সাহিত্যচর্চার কথায় আসি। তাঁকে ই অনুসরণ করে। খুব ছোটেবেলা থেকে ভাই-বোনদের গল্প বলতেন বানিয়ে বানিয়ে। গল্প শুনতে আর পড়তেও ভালবাসতেন। ১৯১৩ সালে কলকাতায় এসে দেখেন 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ; '১লা বৈশাখ, ১৩২০। সেদিনটি এখনও আমার মনে আছে। সন্ধ্যেবেলায় আমরা সকলে দোতলার বসবার ঘরে বসে আছি।...এমন সময় জ্যাঠামশাই হাসতে হাসতে ওপরে উঠে এলেন। হাতে তাঁর সন্দেশের প্রথম সংখ্যা। কি চমৎকার তার মলাট!' আবার লিখেছেন, 'ঐ যে জ্যাঠামশাই 'সন্দেশ' ঢুকিয়ে দিলেন আমদের জীবনে, আমরা মনে হয় কালে-কালে ও-ই আমাকে যতখানি প্রভাবিত করেছিল তেমনই আর কিছু না।...কবে যে নিজে পড়ে বাংলা ভাষায় রস গ্রহণ করতে শিখেছিলাম সে আর মনে নেই। কিন্তু সে যে 'সন্দেশ' এবং জ্যাঠামশাইয়ের ইউ রায় অ্যান্ড সন্সের প্রকাশিত নানা অবিস্মরণীয় বইয়ের জন্যই সম্ভবত হয়েছিল, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।'

কলকাতায় আসার পর যেন নতুন করে বাংলা সাহিত্যের জগৎ উন্মোচিত হল তাঁর কাছে। অন্যদিকে তাঁর ওপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করলেন তাঁদের বড়দা সুকুমার রায়। ১৯১৫ রালে উপেন্দ্রকিশোরের প্রয়াণের পর তিনিই হাল ধরেছিলেন 'সন্দেশ' -এর। এক দিনের কথা : 'একদিন বালিশে লাগাতে বড়দা বলেছিলেন, 'তুইও এসব করবি, কেমন?' আমি আহ্লাদে আটখানা হয়ে শুধু মাথা দুলিয়েছিলাম'। এবার ১৯২২ সালের কথা। 'এই সময় বড়দা হঠাৎ একদিন আমাকে ডেকে বললেন, 'সন্দেশের জন্য একটা ছোট গল্প লিখে দে'। আমি আকাশ থেকে পড়লাম। এমন সৌভাগ্যের কথা আমি ভাবতে পারিনি। কিন্তু পারব তো? বড়দা বললেন, 'পারবিনে কেন? ভাই-বোনদের তো ঝুড়ি ঝুড়ি গল্প বলিস। সেই রকম একটা দে'। বাড়ি এসেই রুদ্ধশাসে খস খস করে লিখে ফেললেন। সুকমার সেটাকে খানিকটা ছেঁটে দিলেন— 'গল্পের নাম দিয়েছিলাম 'লক্ষীছাড়া'। ছেলেটার লক্ষ্মীছাড়ামিতে আপত্তি না জানালেও, বড়দা নামটা বদলে 'লক্ষ্মী ছেলে' করে দিয়েছিল। ১৪ বছর বয়সে এই তাঁর প্রথম গল্প, 'সন্দেশ' -এ প্রকাশিত। ১৯৯৬ সালে ৮৮ বছর বয়সে লেখা তাঁর শেষ গল্প 'বন বেড়ালের ছাঁ' প্রকাশিত হয় ওই 'সন্দেশ' -এই। তার মানে ৭৪ বছর ব্যাপী তাঁর লেখালিখির জগৎ, আর 'সন্দেশ'ই ছিল তার কেন্দ্রবিন্দু। এরকম আর কোনও উদাহরণ আমার জানা নেই।

কিন্তু বড়দা আর 'সন্দেশ' -কে কেন্দ্র করে তাঁর এই আনন্দের জগৎ বেশিদিন টিকল না। ১৯২৩ সালে সুকুমারের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁদের পরিবার এক গভীর সঙ্গটে পড়ে যায়। শেষ অবধি গড়পারের বাড়ি, ইউ রায় অ্যান্ডসন্স 'সন্দেশ' পত্রিকার স্বত্ব সবই নিলামে বিক্রি হয়ে যায়, পত্রিকাটিও বন্ধ হয়ে যায়। লীলা ভাবলেন, 'সন্দেশ নেই, আমার কোথাও গল্প পাঠাতে ইচ্ছে করত না।'। নতুন মালিকরা আবার 'সন্দেশ' প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিলেন আর লীলার মণিদাকে (অর্থাৎ সুকুমারের মেজ ভাই সুবিনয় রায়চৌধুরীকে) সম্পাদকের দায়িত্ব দিলেন। তাঁর কথায় লীলা আবার কলম ধরলেন। লীলার ভাষায় 'এমন সময় মণিদা এসে বলল, সন্দেশের জন্য গল্প না দিলে চলবে না। কি আর বলব, প্রাণটা পক্ষীরাজের মত খানিক তড়বড় করেই ডানা মেলে আকাশে উড়ে পড়ল। মণিদা বলল, 'দিন দশেকের মধ্যে দিস'। সেই আমার 'দিন-দুপুরে' গল্পটি লেখা হল'। মজার কথা এই যে গল্পে লেখিকার নাম ছাপা হয় শ্রী লীলা রায, বি এ। এর পর বেশ কয়েকটি গল্প বেরয় 'সন্দেশ'- এ কিন্তু ১৯৩০ এর দশকে 'সন্দেশ' আবার বন্ধ হয়ে যায়। তারপর দু''চারটে অন্য পত্রিকাতেও লিখেছেন।

১৯৩৯ সাল নাগাদ লীলার প্রথম বই প্রকাশিত হয়, প্রকাশক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য। তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন, 'হাসি খুশি, মাথায় খুব লম্বা নয়, কোথাও অধ্যাপনা করে, বয়সে আমার চেয়ে এক বছরের ছোট; বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো করেছে; তার চেয়েও বড় কথা 'রামধনু' পত্রিকার সম্পাদক এবং সবচেয়ে বড় কথা ওদের একটি প্রকাশনালয় আছে, সেখান থেকে আমার একটি ছোটদের গল্পসংগ্রহ প্রকাশ করা যেতে পরে। ...সন্দেশে, দু-চারটে অন্য কাগজে আমার নিজের আঁকা অপটু কিন্তু সরস ছবিসহ কটি গল্প বেরিয়েছিল, তাই দিয়ে ছোটখাটো একটি বড় করা হবে ঠিক হল। তার মলাটে আঁকবেন একজন অল্পখ্যাত শিল্পী, ক্ষিতিনেরি সমবয়সী। তাঁর নাম শৈল চক্রবর্তী...কিছুকাল পরে সত্যি সত্যি বই বেরুল। ক্ষিতীন আমাকে পঁচিশ কপি দিয়ে গেল। গোলাপী মলাট, মলাটের ওপর পন্ডিতমশাই সেই সাংঘাতিক পান খাচ্ছেন, যার প্রভাবে একটু পরেই বাঁদর বনে যাবেন। বইয়ের নাম 'বদ্যিনাথের বাড়ি'। মলাট দেখে আমরা নিজেরই গা শিরশির করতে লাগল।' প্রসঙ্গত বলি ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত এই আট আনা দামের বইটি বছর দু'য়েক আগে পর্যন্ত চোখে দেখিনি। সম্প্রতি জেরস্ক করে বাঁধিয়ে নিয়েছি। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল রামধনু কার্যালয় থেকে, কিন্তু এর এজেন্ট ছিলেন ভট্টাচার্য, গুপ্ত অ্যান্ড কোং লি: এত ১০টি গল্প ছিল। 'প্রকাশকের বক্তব্য' হিসাবে ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ লিখেছিলেন : 'বাংলা শিশুসাহিত্যে শ্রীযুক্ত লীলা মজুমদারের আবির্ভাব একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অধুনালুপ্ত সুপ্রসিদ্ধ এই প্রতিভাশালিনী লেখিকা সম্বন্ধে সমালোচক মহলে সপ্রশংস বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়— এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত তাঁর পরবর্তী প্রত্যেকটি লেখায় যে ভাব অব্যাহত থাকে। লেখিকার গল্প বলার অসাধারণ ক্ষমতা, অদ্ভুত অদ্ভুত পরিস্থিতি সৃষ্টির কৌশল, সম্পূর্ণ নিজস্ব অতি-সরস বর্ণনাভঙ্গি এবং সর্বোপরি অনাবিল হাস্যরস সৃষ্টির অদ্ভুত শক্তি শুধু ছোটদের নয়, বড়দেরও রীতির কৌতূহলী করে তোলে'। যখন ভাবি এসব কথা ১৯৩৯ সালে লেখা, তখন মানতেই হয় ক্ষিতীন্দ্রনারায়নের জহুরির চোখ ছিল।

এর কয়েকবছর বাদে একটা ঘটনা ঘটল যা লীলা ভুলতে পারেনি। তাঁর ভাষায় 'একদিন কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হল। সেই সুকুমার সমুজ্জ্বল কামাক্ষীর বর্ণনা দেওয়া শক্ত। আমার চেয়ে হয়তো আট দশ বছরের ছোট, পাতলা, ফর্সা মানুষটি, চোখে সরল দৃষ্টি। এমন মিষ্টি মানুষ আমি কম দেখেছিলাম।...তা কামাক্ষী একদিন এসে বলল, 'রংমশালের ভার নিয়েছি। একটা কিশোর উপন্যাস চাই'। এ আমার কেমন কথা? উপন্যাস লিখেছি নাকি কখন? সে বলল, 'না লিখে থাকলে এখন লিখবার সময় হয়েছে'। কিছুতেই ছাড়ল না। ওর কথা শুনে কেমন একটা শখ চেপে গেল। লিখেই ফেলা যাক। মুশকিল হল যে মাথায় গল্প না গজালে গল্প লিখতে পারি না। রাতে সেই কথা ভাবতে ভাবতে ঝপ করে একটা গল্প গজাল। সকালের আগে ডালপালা বিস্তার করে একটা গাছ হয়ে গেল।...সে যাই হক, কামাক্ষীর কথায় 'পদীপিসীর বর্মি বাক্স' লেখা হয়েছিল। পাঠকরা মহাখুশি। পরের বছর 'ভয় যাদের পিছু নিয়েছে' ধারাবাহিকভাবে বেরোল। আরও পরে যখন বই হল, নাম হল তার 'গুপির গুপ্ত খাতা।'

অবশ্য এ দুটি বই গ্রন্থাকারে বেরয় কয়েক বছর বাদে। তার আগেই 'আমার ভাইপো মাণিক, অর্থাৎ সত্যজিৎ বলল, 'তোমার সব ছোটদের গল্প আমাকে দেবে? বই হবে'। বললাম 'কে বই করবে?' ও বলল, 'এ দেশের সবচেয়ে ভালো প্রকাশক।' বললাম, কে সে? ও বলল 'সিগনেট প্রেস'। আমি বললাম 'তুই তার সঙ্গে জড়িত আছিস।' মাণিক বলল 'আছি'। অমনি রাজি হয়ে গেলাম? পরে বদ্যিনাথের বড়ির সব গল্প এবং আরও কতগুলি বাছাই করা গল্প নিয়ে গেল মাণিক। বলে গেল ও-ই ছবি আঁকবে। ১৯৪৮ সালে দিন-দুপুরে বেরোল। এবং দিলীপ গুপ্ত নামে একজন অবিস্মরণীয় মানুষের সঙ্গে আমার চেনাশোনা হল। আর আমি ফিরে চাই নি'। আবার পরে দিলীপ গুপ্ত বা ডি কে সম্বন্ধে বলেছেন, 'কোনও দ্বিতীয় শ্রেণীর জিনিস তার হাত থেকে বেরোত না। সব দিকে তার চোখ ছিল, কাগজ ভালো, কালি ভালো, মলাট ভালো, ব্লক ভালো, ছবি ভালো, লেখক ভালো। সম্ভাব্য লেখককে কেমন করে তার স্বকীয়তা নষ্ট না করে দিয়ে প্রথম শ্রেণীর লেখকে দাঁড় করিয়ে দিতে হয়, দিলীপ তা জানত'। এই 'দিন-দুপুরে' বই দিয়েই মেজপিসির লেখার সঙ্গে আমার পরিচয়। আমাদের বসবার ঘরের আলমারিতে রাখা থাকত, হলদে-কালো-ছাই চৌখুপি ডিজাইন করা মানিকদার মলাট আর সেই অনবদ্য লেখা— গণশার চিঠি, ভুতের ছেলে আশ্চর্য কার্যকলাপ, গঙ্গুদার গান, নতুন ছেলে নটবরের চরিত্র বা বদ্যিনাথের বাড়ি অদ্ভুত প্রয়োগ—এই সবই এখনও এক নিমেষে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায় পঞ্চাশ বছর আগের সেই ছোটবেলায়। সিগনেট প্রেস বিজ্ঞাপন হিসাবে অন্য বইয়ের শেষে দু'চার লাইনে লিখে দিয়েছেন 'বাংলা শিশু সাহিত্যের আসরে সুকুমার রায় যে কীর্তি স্থাপন করেছিলেন, লীলা মজুমদার তার যোগ্য উত্তরাধিকারিণী। তাঁর বই ছোটোদের জন্য লেখা বড়োদের গল্প নয়, বড়োদের জন্য লেখা ছোটোদের গল্প নয়, সত্যিকারের ছোটেদের গল্প'। এই বই পড়ে রাজশেখর বসু লিখেছিলেন, 'ছেলেমানুষ আর বুড়োমানুষ এক জগতে বাস করে কিন্তু দুজনের দৃষ্টি সমান নয়। আমরা ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে যে অদ্ভুতলোকের সংস্পর্শে আসি, বড়ো হলে তা ভুলে যাই। দৈবক্রমে কেউ কেউ বড়ো হয়েও বাল্যের দিব্যদৃষ্টি বজায় রাখেন। এঁরাই সার্থক শিশুসাহিত্য লিখতে পারেন। 'দিনদুপুরে'-র লেখিকা লীলা মজুমদারের এই দুর্লভ বাল্যদৃষ্টি আছে। ...পড়তে পড়তে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ বা সুকুমার রায়ের রচনা।'

এর পর সিগনেট থেকে প্রকাশিত হয় 'পদপিসীর বর্মি বাক্স'। লীলা লিখেছেন, 'আমার ৪২ বছর বয়স। 'দিন-দুপুরে'-র পর 'পদীসিসীর বর্মি বাক্স' বেরোল। সিগনেটের প্রকাশনা, মাণিকের মলাট, অহিভূষণ মালিকের আঁকা ছবি। দিলীপের পরিকল্পন বলাই বাহুল্য'। এখানে তাঁর স্মৃতিতে একটু ভুল হয়েছে। বইটি প্রকাশ পায় ১৩৬০ সনের শ্রাবণ মাসে (অর্থাৎ ১৯৫৩ সালে), প্রথম সংস্করণ দেখেই বলছি, আরও প্রমান, প্রথম পাতায় মেজপিসির স্বহস্তে লেখা 'মেজপিসির রাজাকে, রাজার মেজপিসি'। তারিখটা আমার পাঁচ বছরের জন্মদিন। জন্মদিনে এমন উপহার কেউ কখনও পেয়েছে? মানিকদার আঁকা সেই লাল ড্রাগন-মুখো বর্মি বাক্সের ছবি জ্বলজ্বল করছে মলাটে, ভিতরে অহিভূষণ মালিকের (সকৌতুকে লক্ষ করলাম বইতে লেখা আছে অহিভূষণ মল্লিক) অনবদ্য সব লাইন ড্রয়িং, চিমড়ে ভদ্রলোক আর পাঁচুমামার বাচনভঙ্গি—ছোটদের মনকাড়ার সব উপকরণই ছিল এখানে। আমাদের মনও ৫৪ বছর ধরে বাঁধা পড়ে আছে সেইখানে।

এরপর তাঁর বেতার-জীবনের কথা। যদিও বেতারে চাকরির অনেক কিছু তাঁর পছন্দ ছিল না, তবু এই সময়ে তাঁর লেখার হাত যেন খুলে গেল। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৩ সলের মধ্যে বেশ কযেকটি বড়দের বই ছাড়াও প্রকাশ পায় তাঁর ছোটদের জন্য লেখা ১৫টি গল্প, উপন্যাস, নাটক বা জীবনীর বই। তিনি লিখেছেন, 'আবার বলব আমার বেতার জীবন ামি ভারি উপভোগ করেছিলাম। আমার মনে বিস্তারও অনেক বেড়ে গেছিল। অজস্র ছোট গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস লিখেছিলাম। সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকতাম আর মনটা চাকরির মতো ঘুরত। ক্রমে প্রকাশকদের সঙ্গেও আলাপ হল। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির। আর বিশেষ করে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটের পাবলিশিং কোম্পানি।...ছোটদের জন্য আমরা অনেকগুলি বই প্রশান্ত রায়ের আঁকা ওয়াশ দেওয়া ছবি হাফটোন ব্লকে ছাপিয়ে অনবদ্য চেহারা দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। তার মধ্যে বক-ধার্মিক, গুপির গুপ্ত খাতা, জয়ন্ত চৌধুরীরর সহযোগিতায় লেখা টাকা-গাছ, টং লিং, হলদে পাখির পালক -এর নাম করতে হয়'। তিনি আবার লিখেছেন, 'আমার ঐসব ছোটোদের উপ্যাস গল্পদাদুর আসরে ধারবাহিকভাবে পড়া হত। টাকা-গাও তাই। হলদে পাখির পালক কাজের তাড়ার মধ্যে আমার মনে জ্যান্ত হয়ে উঠেছিল। আমি ৬ দিনের ছুটি নিয়ে শান্তিনিকেতনের বাড়িতে বসে বইটি আগাগোড়া লিখেছিলাম। ওর মধ্যে এখনকার বাতাস বড়, রোদ ওঠে। ফিরে গেলে প্রেমেনবাবু ও নামকরণ করেন। তারপর জয়ন্ত গল্প দাদুর আসলে পড়ল। বইটি অনেকের ভালো লাগে। বহু পুরস্কারও পেয়েছে। ...কয়েকটি ছোটোদের উপযুক্ত সরস নাটকও লিখেছিলাম এই সময়ে। তার মধ্যে ছিল বক - বধপালা। জয়ন্ত সেটি একবার রেডিও সপ্তাহে মঞ্চস্থ করে বলাকা প্রকাশনী থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশও করিয়ে দিয়েছিল। লঙ্কা দহন লিখেছিলাম, ক্ষণস্থায়ী কনটেম্পোরারি পাবিলিশার্স বই করেছিলেন ১৯৬৪ সালে, আমি রেডিও ছাড়বার পর'। আবার লিখেছেন, 'সেটা ছিল ১৯৫৯-৬০। 'বাঘের চোখ' বলে ছোটদের একটা গল্প সংগ্রহ বেরিয়েছিল। দুঃখের বিষয়, তার একটিও কপি পাচ্ছি না। গল্পগুলি এশিয়া প্রকাশিত আমার রচনাবলীতে ছড়িয়ে আছে। নিজেই তাদের চিনতে পারি না। ঐ বছরই 'গুপির গুপ্ত খাতা' বলে আমার একটা দুঃসাহসিক অভিযানের সরস গল্প ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড বই করে বের করলেন। তার ছবিও প্রশান্ত আঁকল। এই সংস্করণটি এখন দুষ্পাপ্য। নতুন সংস্করণ অন্য ছবি দিয়ে এশিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে। গল্পটি এর কিছুদিন আগে রংমশালে 'ভয় যাদের পিছু নিয়েছে' নামে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল। 'বক-ধার্মিক' ঐ পত্রিকায় বেরিয়েছিল'। এই সময়ের সবচেয়ে বিখ্যাত বই অবশ্যই 'হলদে পাখির পালক', বইটি দুটি জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছিল। ১৯৬৪ সালে 'বক-বক পালা' নাটকটিও সংগীত নাটক অকাদেমি পুরস্কার পায়। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 'লীলা মজুমদারের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প'। এর ভূমিকায় লীলা লিখেছেন, 'আর সকলে কেমন গল্প লেখে আমার ঠিক জানা নেই, তবে আমি লিখি মনের খুশিতে আর সেই খুশির খানিকটা পাঁচজনার মধ্যে বিলিয়ে দেবার জন্য। কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আমি লিখি না, কিছু শেখবার জন্য নয়, প্রমাণ করবার জন্য নয়, প্রশংসা পাবার জন্য নয়, আমার গল্প লেখা সার্থক হয়েছে বলে মনে করি'। এই আনন্দ দেবার ব্যাপারে অবশ্যই তাঁর সাফল্য প্রশ্নাতীত।

১৯৬০-এর দশক সম্বন্ধে বলেছেন যে তাঁর দুই নাতনি আর পরে দুই নাতির জন্ম তাঁর কাছে খুবই বড় ঘটনা কারণ তাতে এক ধাক্কায় তাঁর বয়স অনেক কমে গিয়েছিল। আর 'অন্য বড় ঘটনাটি হল আমার বড়দা সুকুমার রায়ের ছেলে সত্যজিৎ 'সন্দেশ' পত্রিকাকে পুনর্জীবিত করল'।

'সন্দেশ' প্রসঙ্গে বলেছেন, '১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে 'সন্দেশ' প্রতিষ্ঠা করে, তার দু বছর পরে বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়স্বজনের হাতে সব কিছু ফেলে উপেন্দ্রকিশোর চলে গেছিলেন। সুকুমারের বয়স তখন ২৭-২৮। তার ৮ বছর বাদেই তিনিও স্বর্গে গেলেন। তার আগের বছর তাঁরই প্ররোচনায় (বলা যায়) আমার প্রথম গল্প লেখা ও পত্রিকায় ছাপা হল। ...কয়েক বছর পরে আমি যখন কলেজে পড়ি তখন আমার মণিদা অর্থাৎ সুকুমারের মেজভাই সুবিনয়ের সম্পাদনায় বছর তিনেক 'সন্দেশ' পত্রিকা বেরিয়েছিল। ১৯৩১ সালে একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছিল। ...ঐ যে একটি পথ পেয়ে গেলাম, আর ছাড়লাম না। সন্দেশ উঠে গেলে মৌচাক, রামধনু, রংমশলারে নিয়মিত লেখক হয়ে গেলাম। ১৯৫৬ সাল থেকে বেতারের ছোটদের অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে হাতটা আরও জোরালো হতে থাকল। কিন্তু মনের মতো পত্রিকা আর একটিও পেলাম না'। এর পর '১৯৬১ সালে ৩০ বছরের ব্যবধানের পর মাণিকের হাতে আঁকা ছবি দিয়ে সাজানো অপূর্ব চেহারা নিয়ে আবার সন্দেশ বেরোল এবং সেই ইস্তক আজ ২২ বছর ধরে নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে। তার প্রধান কারণ অবশ্য মাণিকের আর নলিনী দাসের অক্লান্ত সহায়তা। নিজের টাকা দিয়ে পত্রিকাটিকে মাণিক প্রতিষ্ঠা করল। প্রথম সম্পাদক হলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর নামের আর সাহায্যের গুণে সন্দেশের একটা প্রতিষ্ঠা হল। পরে পত্রিকা পরিচালনার নানা অসুবিধার কারণে সুকুমার সমবায় সমিতি বিধিমতে প্রতিষ্ঠিত হল এবং আজ পর্যন্ত তাঁরাই কাগজ চালিয়ে আসছেন। আমাদের তিনজন সম্পাদক। তার মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা আমি, তারপর উপেন্দ্রকিশোরের মেজ মেয়ে পূণ্যলতার মেয়ে নলিনী দাস, সবার ছোট সত্যজিৎ। তারো ৬২ বছর বয়স হল'। এসব কথা অবশ্য ১৯৮৩ সালে লেখা। ১৯৯২ সালে সত্যজিৎ আর পরের বছর নলিনীর প্রয়াণের পর গুরুতর অসুস্থতার জন্য ১৯৯৪ সাল থেকে তিনি আর দৈনন্দিন সম্পাদনার কাজ করতে পারেননি, যদিও আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্পাদকীয় দায়িত্বে ছিলনে ২০০৩ সাল পর্যন্ত। তিনি বার বার বলেছেন, 'সারা জীবন ধরে যতরকম কাজ করেছি, তার মধ্যে সন্দেশের কাজ সবচেয়ে আনন্দদায়ক। যত সম্মান পেয়েছি, সন্দেশের সম্পাদক হবার কাছে তার কিছুই লাগে না।'

'সন্দেশ' -কে কেন্দ্র করেই তাঁর পরবর্তীকালের শিশুসাহিত্য সাধনা; 'মোটকথা ১৯৬১ থেকে আমার অধিকাংশ ছোটদের ছোট গল্প প্রথমে সন্দেশে বেরিয়েছে আর যদ্দুর মনে হয় পক্ষীরাজে প্রকাশিত 'ময়না-শালিখ' আর রোশনাইতে 'নাকু-গামা' ছাড়া সব উপন্যাসও ধারাবাহিকভাবে সন্দেশে বেরিয়েছে। এইভাবে এক একে টং লিং, মাকু, নেপোর বই, বাতাস বাড়ি, হাওয়া দাঁড়ি, হট্টমালার দেশে (রেমেনবাবুর সঙ্গে লেখা), লঙ্কাদহন নাটক, ভুতোর ডাইরি ইত্যাদি সব গল্পই সন্দেশের পাতায় প্রথম ছাড়া পেয়েছিল।' এই লেখাগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। প্রথম বছরেই (১৯৬১) 'সন্দেশ'-এ ধারাবাহিক হিসাবে বেরয় 'টং লিং'—চাঁদ, বিশে আর সিংহর কল্পনার জগৎ কেমন করে পেরিস্তানের খোঁজে মিলেমিশে যায় বাস্তবের কালো মাস্টার, আলো আর বাঘার জগতের সঙ্গে। 'মাকু' -কে বলা হয়েছে লীলা মজুমদারের প্রথম কল্পবিজ্ঞানের গল্প, যদিও এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের মত পরে বলা হয়েছে। আর 'নেপোর বই' তো তাঁদের নিজের বেড়াল নেপোলিয়ন ওরফে নেপোর ছায়ায় লেখা— লীলা মজুমদারের প্রথম কল্পবিজ্ঞানের গল্প, যদিও এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের মত পরে বলা হয়েছে। আর 'নেপোর বই' তো তাঁদের নিজের বেড়ার নেপোলিয়ন ওরফে নেপোলিয়ন ওরফে নেপোর ছায়ায় লেখা—লীলার মতো 'বেড়ালীর ব্যাপার। খুব রসের'। এই সময়েই সন্দেশে প্রকাশিত হয় 'হট্টমালার দেশে'—তাঁর আর প্রেমেন্দ্র মিত্রের যৌথ রচনা। এই বই প্রকাশের ধারা চলতেই থাকল। লীলার ভাষায় '৭৪ সালে এশিয়া সম্পাদিত 'রোশনাই' পত্রিকাতে ধারাবাহিকভাবে দুটি ছোট ছেলের দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প 'নাকু-গামা' বেরোল। ...৭৪ সালে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে আমার প্রথম বই 'বাতাস বাড়ি বেরোল, নিরাভরণ চেহারা নিয়ে, নিঃশব্দে। বিশেষ কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করল বলে মনে হয় না। যাকে বলে ফ্যান্টাসি। আমাদের পাঠকরা মহা খুশি। ...বিমলাকে হাতি গল্পে ভরা 'হাতি! হাতি!' বইখানি দিলাম। গল্পগুলো আমার স্বকপোলকল্পিত নয়। কত শুনেছি, কতক কাগজে পড়েছি, কতক আমার চেনাজানার মধ্যে ঘটেছে। তাপস দত্তর ছবি দিয়ে সুন্দর বই করল। পাঠকরাও খুব পছন্দ করল।...বিমলাকে পর পর আরও দুটি বই দিলাম, 'আরও ভূতের গল্প' ১৯৮১ আর সন্দেশে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'ভুতোর গল্প' ১৯৮১ 'ভুতোর ডাইরি', ১৯৭৯। ভালো করে সব বই ছাপে বিমলা'। আবার লিখেছেন, 'আমার স্নেহাস্পদ সমরেশ বসুর ছেলে দেবকুমার। সে কলকাতায় আমার সঙ্গে আলাপ করল। ওদের প্রকাশনীর নাম মৌসুমী। তাদের আমার ছোটদের আরব্য রজনী দিলাম। আরেকটি বইও দু-খণ্ডে প্রকাশ করেছে। সেটি হল ছোটদের জন্য দেশ-বিদেশের সেরা গল্প। অনুবাদ নয়। গল্পগুলির সারাংশ সরস বাংলায় লেখা। ...বিমলা হাতির বই ছেপেছে, এবার কুকুর ও অন্যান্যদের নিয়ে একটা নতুন বই করছে। নিউ স্ক্রিপ্ট 'হাস্য ও রহস্যের গল্প' ছেপেছিল, এবছর 'আজগুবি' ছাপল। শৈব্যা ছাপল 'কল্পবিজ্ঞানের গল্প', আনন্দ পাবলিশার্স ছাপল 'সব ভুতুড়ে'। এর আগে তারা 'কাগ নয়' বলে বাছাই করা ছোট গল্প সংগ্রহ প্রকাশ করেছিল। এসব গল্প আগে বই হয়নি। 'কাগ নয়' গল্পটি আমার ১৯/২০ বছর বয়সে লেখা। আজগুবি। আজগুবির প্রতি আমার বড় দুর্বলতা। কিংবা বরিষ্ঠতাও বলা চলে। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড 'হাওয়ার দাঁড়ি' প্রকাশ করেছেন। পরিবেশ বিজ্ঞানের গল্প। স্রেফ আজগুবি। উদয় থেকে 'ময়না-শালিখ' বেরিয়েছে, আজগুবি নয়, একটু খামখেয়ালী। বাস্তবিকই বইয়ের মধ্যে গেঁথে না দিলে গল্প হারিয়ে যায়। একথা বাহান্ন বছর আগে আমার প্রথম বই বেরোনোর অনেক আগে রবীন্দনাথ বলেছিলেন'।

'পাকদন্ডী' বইটিকে অনুসরণ করে তাঁর-শিশু-কিশোর সাহিত্যের পরিক্রমা করা হল, তবে 'পাকদন্ডী' তো ১৯৮৩ সালে লেখা। এর পরেও তাঁর অনেক বই বেরিয়েছে, অধিকাংশই গল্প সঙ্কলন। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দেজ পাবলিশিং-এর 'গুপের গুপ্তধন' (১৯৮২), 'কিশোর বিচিত্রা' (১৯৮৬), ও 'মণি মাণিক' (১৯৯৬), এশিয়া 'সেজোমামার চন্দ্রযাত্রা' (১৯৮২), অন্নপূর্ণার 'গুপী পানুর কীর্তিকলাপ' (১৯৮০) আর শিশু সাহিত্য সংসদের কয়েকটি অপূর্ব ছোট ছোট বই — 'গোলু' (১৯৭৯), 'জানোয়ার" (১৯৮১), 'আম গো আম' (১৯৯১), 'পটকা চোর' (১৯৯১), 'টিপুর ওপর টিপ্পুনি' (১৯৯১) আর 'বেড়ালের বই' (১৯৯২)। সন্দেশ পত্রিকায় তাঁর বেশ কয়েকটি নাটক প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে 'বক-বধ পালা" আর 'লঙ্কাদহন পালা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, যদিও বইগুলি এখন দুষ্প্রাপ্য। সবকটি নাটক নিয়ে দেজ প্রকাশ করেন 'লীলা মজুমদারের ছোটদের সমগ্র নাটক' (১৯৮৪)। এতে উপরোক্ত দুটি নাটক ছাড়াও আরও ছটি নাটিকা সঙ্কলিত আছে। ছোট গল্প সংগ্রহ ছাড়া তাঁর প্রথম রচনা সংগ্রহ ওরিয়েন্ট লংম্যান-এর 'ছোটদের অমনিবাস' (১৯৬৫) অধুনা দুষ্প্রাপ্য। এর পর এশিয়া তাঁর রচনাবলি প্রকাশ

করেছিলেন ছয় খণ্ডে (১৯৭৬-৮৬), যদিও এটি অসম্পূর্ণ। আরও অনেক প্রকাশক নানা ধরনের অমনিবাস বার করেছেন, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেযযোগ্য এশিয়ার 'ছোটদের অমনিবাস" (১৯৯৫) আর শিশু সাহিত্য সংসদের 'চিরকালের সেরা' (১৯৯৭)।

তাঁর এইসব গল্প-উপন্যাসের মধ্যে কয়েকটি ধারা সতত প্রবহমান। প্রথমত, প্রকৃতি - প্রেম তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। ছোটবেলায় শিলং-যে আর কিছুটা বড় বয়সে শান্তিনিকেতনে অনেকদিন কাটানোর ফলে তাঁর বহু বইয়ের বা গল্পে তা সরাসরি ধরা পড়েছে। 'হলদে পাখির পালক' তার একটা বড় উদাহরণ। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে নৈকট্যের জন্যই দুমকার কথা এখানে বা অন্য কয়েটা গল্পে এসেছে বারবার। পাখির ডাক, ঝরনার শব্দ, হাওয়ার শোঁ শোঁ ডাক, টিনের ছাদে বৃষ্টির আওয়াজ বা পাহাড়ে জড়ানো কুয়াশা এ সবেরই স্বাদ পাওয়া যায় তাঁর বর্ণনায়। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ধারা তাঁর কুকুর-বেড়াল প্রীতি। চিরকালের বন্ধুদের প্রসঙ্গে বলেছেন, 'সবাই তারা মানুষও নয়, কুকুর-বেড়াল'। একথা বলে সেই ছোটবেলার 'নিষিদ্ধ ছাই রঙের বেড়াল' থেকে 'বাস্তব কর্মী, নেপো বা নোপোলিয়নের কথা বলেছেন, বলেছেন ফক্স টেরিয়ার ডিকি, বুল ডগ—নেড়ি সঙ্কর ল্যাডি, বিরাট আকারের একটু বদমেজাজি ব্রাউনি, 'লাল রূপের ডালি' আইরিশ সেটার জনি আর ফক্স টেরিয়ার ভুলোর কথা। শেষ চারজনকে তো আমরা দেখেছি বটেই, আর দেখেছি হিংসুটে ডাশহুন্ড জেরিকে। রোশফুকোর অনুসরণে বার বার 'যতই মানুষ দেখি, ততই কুকুর ভালোবাসি'। ক্লাসিক পর্দায়ে পড়ে। প্রথমটিতে আছে সেই অনবদ্য বর্ণনা : 'তাকে উলটে দেখলাম থাবার তলাটা গোলাপি মখমলের মতো, মাঝে মাঝে কচি কচি সাদা লোম। পেটের তলাটাও গোলাপি—নরম তুলতুলে এক জায়গায় একটা শিরা নাকি ধুকধুক করছে। মুণ্ডুটাকে তুলে আবার নিজের পেট দেখতে চেষ্টা করছে, চোখদুটো বিল বিল করছে। মুখের কাছে তুলে ধরতেই একটা লাল জিভ বের করে আমার গাল-গলা চেটে দিতে লাগল। আঃ! শুধু কুকুর আর বেড়াল নয়, পশু পাখি প্রীতি তাঁর অনেক বইতে ছড়িছে আছে— 'হাতি! হাতি!, 'বাঘের বই', 'জানোয়ার" এসব নামই তার সাক্ষ্য বহন করছে। তৃতীয়ত, তাঁর হাস্যরসের কথা। হাসির গল্প ছাড়াও ডিটেকটিভ গল্প, ভূতের গল্প, চোরের গল্প, কল্পবিজ্ঞানের গল্প—তিনি যা লিখেছেন তাতেই নির্মল হাসির ছোঁয়া। চতুর্থত তাঁর গোয়েন্দা গল্পের হিরো বা অ্যান্টি হিরো গুপী-পানুর ছোটমামা সমাদ্দাত ইনভেস্টিগেশনের মেজো গোয়েন্দা এবং পদে পদেই সেখানে গোয়েন্দাগিরি প্যারডি। 'গুপী পানুর অ্যাডভেঞ্চার', 'দ্বিতীয় টিকটিকি' বা 'নিকুঞ্জের ন্যাকামি' একটু উল্টে দেখলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। পঞ্চমত ভূতের গল্প তাঁর একটি প্রধান অস্ত্র অথচ সে গল্পে ভূত আছে, ভয় নেই। কোথাও ভূতরা মানুষকে ভয় পায়, কোথাও বা তারা পিঠে রান্না শিখতে আসে। এসবের থেকে অবশ্য তাঁর সেই প্রথম দিকের 'ভূতের ছানা'-ই বেশি ভয়াবহ। 'সব ভূতুড়ে' বইটিতে ৪২ টি বাছাই ভূতের গল্প আছে আর তার ভূমিকায় লেখিকা বলেছেন, 'ভূতে বিশ্বাস না করলেও কিছু এসে যায় না। তবে একটি কথা বলি। শুনেছি মরে গেলে শরীরের এক কণাও নষ্ট হয় না। সবই পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে চিরকাল রক্ষা পায়। তবে মানুষের সত্তার শ্রেষ্ঠাংশই বা বিনষ্ট হবে কেন?। আরও বলি, মরে গেলে সেই শ্রেষ্ঠাংশের একটা অশুভ পরিণতিই বা হবে কেন? বিধাতার মঙ্গলবিধানে আমার আত্মা আছে, তাই আমার এই ভূতদের একটু সুনজরে দেখতে হবে'। ষষ্ঠত, তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের ধারা 'মাকু', 'বাতাস বাড়ি', 'হাওয়ার দাঁড়ি' প্রভৃতি উপন্যাসকে এই ধারায় ফেলা যেতে পারে, যদিও তিনি নিজে বলেছেন তাঁর লেখা বিজ্ঞানভিত্তিক নয়, বরং ফ্যান্টসি বা আজগুবি। আর কল্প-বিজ্ঞান কথাটাই তাঁর পছন্দ নয়, বলেছেন 'কথাটা অদ্ভুত। পুত্র-কল্প মানে যদি পুত্রের মতো হয়, তাহলে কল্প-বিজ্ঞান মানে দাঁড়ায় বিজ্ঞানের মতো কিছু। অর্থাৎ ঠিক বিজ্ঞান নয়, তবে দেখলে বিজ্ঞান বলে ভুল হতে পারে। এ তো বড় সাংঘাতিক ব্যাপার! ছোট ছোট পাঠক যাদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে প্রায় কোনও জ্ঞানই নেই, তাদের যদি এমন সব গল্প শোনানো যায় যা পড়লে বৈজ্ঞানিক ব্যাপার বলে মনে হবে, কিন্তু আসলে তা নয়— তাহলে ঐ কচি পাঠকদের কপালে ভবিষ্যতে দুঃখ থাকতে পারে। তার চেয়ে সোজাসুজি আমি বলি আজগুবি গল্প। ফ্যান্টাসি। ...সত্যিকার বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প লেখেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, ক্ষিতীন্দ্রনারাণ ভট্টাচার্য, অজেয় রায়, সংঙ্কর্ষণ রায় এবং আরও কেউ কেউ। অদ্রীশ বর্ধনও বিশেষ করে বিখ্যাত বিজ্ঞান ভিত্তিক বিদেশী গল্প অনুবাদ করে। এসব গল্পকে আমি অনেক উঁচুতে স্থান দিই'। সব শেষে বলি একটা মজার কথা—লীলা মজুমদারের গল্পে গুপি, পানু, বিশেষ, নগা, বটু, কলু এসব নামের ছড়াছড়ি আর বলাইবাহুল্য, এরা কেউ খুব সুবোধ বালক নয়। গুপি নামটা তাঁর এত প্রিয় ছিল যে বড় নাতির নাম দেন গুপি, ছোট নাতিরও নাম বিশে দেবার ইচ্ছে ছিল— বাড়ি সুদ্ধ লোকের আপত্তিতে তা হয়নি। অথচ এসব গল্পে মেয়ে নেই বললেই চলে— অবশ্য হলদে পাখির পালক-এ রুমু ছিল, যে খালি দাদার কাছে বকুনি খায় 'রুমু, ফ্রক নামাও, পেট দেখা যাচ্ছে'। প্রথম যে গল্প মেয়েদের একটা ভূমিকা এল, সে 'মাকু' —সোনা আর তার ছোট বোন টিয়া সেখানে দুই হিরোইন। আসলে লীলার জীবনী পড়লেই বোঝা যাবে তিনি নিজে ছিলেন গেছো মেয়ে, যাকে ইংরাজিতে 'টম বয়' বলা হয়। মনে মনে নিজেকে দুষ্ট ছেলে বলে ভাবতেন হয়ত। তবে তাঁর প্রথমদিকের গল্পে মেয়েরা একেবারে নেই তা নয়— মনে পড়ে 'দিন-দুপুরে' -র সেই বিখাত উক্তি 'টুনু আর হাবু দুটো পোষা বাঁদর'? আসলে টুনী আমার মায়ের নাম আর হাবু আমার ছোটপিসি। মেজপিসি তাঁর নিজের বাঁদরামি চিহ্ন রেখেছিলেন এইভাবে।

১৯৬০ এর দশকে তাঁর পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে বাংলার বাইরে, সারা দেশে। তার মূলে চিলড্রেন্স বুক ট্রাস্টের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া। তাঁর নিজের ভাষায় : 'কোন সময় যে চিনড্রেন্স বুক ট্রাস্টের সঙ্গে জনিয়ে পড়েছিলাম তা মনে পড়ে না। ...ছোটদের নিয়ে কারবার, তক্ষুনি আকৃষ্ট হলাম। তাছাড়া সংস্থার প্রাণপুরুষ শঙ্কর পিল্লেইকে একবার দেখলে ভোলা যায় না...আমার তিনখানি ইংরাজি বই ওঁরা প্রকাশ করেছেন—টাইগার টেল্‌স, তার বাংলাও করে দিয়েছি 'বাঘের বই' নামে, 'রিপ দি লেপার্ড' আর 'দি হাউস বাই দি ইড'। এই তিনটি তাঁর প্রথম ইংরাজি বই। পরে দিল্লিতে একটা আলোচনা চক্রের পর ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট স্থির করলেন নেহরুর স্মৃতিতে 'নেহেরু বাল পুস্তকালয়' নামে ১০০টি ছোটদের বই প্রকাশ করবেন। 'আমাদের সকলের কাছেই বই চেয়েছিলেন।...আমাকে ফরমায়েস দেওয়া হল 'নদী কথা' লিখে দিতে হবে। আমি উত্তর ভারতের নদ-নদী নিয়ে নির্দিষ্ট মাপের একখানি বই করে দিলাম। পরে আরেকটি চাইলেন, আমি 'বড় পানি' লিখলাম গল্পের আকারে। শিলংয়ের উপকণ্ঠবাসীদের জীবনযাত্রার কল্প। তাতে কেন্দ্র করে এই বই। ১৯৮০ সালে আরেকটি চেয়েছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের শৈশব কৈশোরের কথা। তাঁর প্রথমবারের বিলেত - যাত্রা দিয়ে শেষ। নদী-কথা চোদ্দটি ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। অন্য দুটি বোধহয়

ইংরাজিতে আর বাংলায়। হিন্দীতেও হবে বোধহয়'। শেষোক্ত বইটির নাম Jorasanko House, লীলার মেয়ে কমলা চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদে 'জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি' নামে বাংলায় প্রকাশিত হয়। এর পরে Homecoming নামে আর একটি ইংরাজি বই প্রকাশ করেন ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট।

এর পাশাপাশি এটিও বলা দরকার যে অনুবাদ নিয়ে তাঁর কোনও ছুঁৎমার্গ ছিল না, নিজেই লিখেছেন, 'আমি ভাবি পৃথিবীর সব ভাষায় শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যসব ভাষায় অনুবাদ হওয়া উচিত'। আবার লিখেছেন, সাহিত্য আকাদেমির জন্য 'আমি জনাথান সুইফ্‌টের একটি বিখ্যাত ইংরাজি মূল বইয়ের আগাগোড়া বাংলা করে দিয়েছিলাম। তার নাম গালিভারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত। চার খণ্ডে লেখা ঐ ইংরাজি বইটির সবটা পড়ার সুযোগ সকলের হয় না। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল এমন সরস সার্থক বই পৃথিবীতে কম আছে। ...পড়ে যত আনন্দ পেয়েছি, অনুবাদ করতেও ততই'। আবার লিখেছেন 'অন্নপূর্ণা প্রকাশনীর জন্য দুটি ইংরাজি বইয়ের বাংলা করে দিয়েছিলাম। একটি হল লালবিহারি দে-র ফোক টেলস অফ বেঙ্গল। অপরটি তাঁরই বেঙ্গল পেজেন্ট লাইফ। প্রথমটি ঠিক অনুবাদ নয়। বয়স্ক ইংরেজ পাঠকের জন্য লেখা। আমি কাঠামোতে দেহ গড়ে ছোটদের উপযুক্ত করে দিয়েছিলাম। খুব জনপ্রিয় হয়েছে ঐ বই। দ্বিতীয়টি অনুবাদ নাম দিতে চাইলাম 'বাংলার কৃষি জীবন'। তা প্রকাশকের পছন্দ হল না। নাম দিলেন 'গ্রাম বাংলার উপকথা'। অন্যত্র লিখেছেন, 'অনেক অনুবাদ করেওছি। সব যে খুব মনের মতো বই তাও নয়। ...আগরতলার ঝরনা প্রকাশনীর জন্য ঈনিড ব্লাইটনের দশটি বাছাই করা ছোটেদের রহস্যের বই অনুবাদ করে দিয়েছি। মূল বইগুলি ভবিষ্যৎ লেখকদের পথ দেখাতে পারবে। ঝরঝরে ভাষা, কৌতুহলোদ্দীপক রহস্য, বুদ্ধি দিয়ে সমস্যার সমাধান। রহস্যের বই লেখাও একটা শিল্প। গালিভারের ভ্রমণ বৃত্তান্তের কথা আগে লিখেছি। হেমিংওয়ের 'দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সী' করেছি। চিলড্রেন্স বুক ট্রাস্টের অনেক বই করে দিয়েছি।' এই তালিকার বাইরেও এনিড ব্লাইটনের আরও কয়েকটি গল্প, হ্যান্স অ্যান্ডারসনের সমগ্র রচনাবলি এবং শিশু সাহিত্য সংসদের জন্য আরও কয়েকটি বই অনুবাদ করেছিলেন ছোটদের জন্য। এছাড়া বড়দের জন্যও কিছু বই অনুবাদ করেছেন। একটি কথা আমরা প্রায় ভুলেই গেছি। ১৯৭৬ সালে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের জন্য মহাশ্বেতা দেবীর লেখা 'একবাড়ি স্বপ্ন' বইটির ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। এটিই একমাত্র বই যা লীলা বাংলার থেকে ইংরাজিতে অনুবাদ করেছিলান। সম্প্রতি তাঁর কাগজ ঘাঁটতে গিয়ে আবিষ্কার করেছি যে অস্কার ওয়াইল্ডের The Importance of Being Earnest বইটি আগাগোড়া অনুবাদ করেছিলেন। অবশ্য এটি এখনও অপ্রকাশিত।

গল্প উপন্যাস, নাটক, অনুবাদ ছাড়াও অনেকগুলি জীবনী লিখেছিলেন প্রধানত ছোটদের জন্য। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব দিয়ে তার সূচনা: '১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ত্রিবেণী থেকে ছোটেদের জন্য কবির জীবনের গল্প 'এই যা দেখা' লিখেছিলাম। সরকারী অনুরোধ লেখা শুরু করে, ভুল বোঝার ফলে কানাই সরকারকে পাণ্ডুলিপিটি দিয়েছিলাম। ঐ বছর দিল্লির সাহিত্য আকাদেমির অনুরোধে ১৬ পৃষ্ঠায় অতি সংক্ষেপে 'কবি কথা' লিখেছিলাম। তার নব মুদ্রণ এখনও চলছে'। ১৯৬৩ সালে উপেন্দ্রকিশোরের শতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপনের জন্য যে কমিটি গঠিত হয়, তারা লীলাকেই উপেন্দ্রকিশোরের জীবনী লেখার দায়িত্ব দেন। লীলার ভাষায় : 'কৃতার্থ হয়ে গেছিলাম। মায়ের কাছে শোনা সেই সব অবিস্মরণীয় ঘটনা আর বর্ণনা নিজের ছোটবেলা থেকে সেসব কথা মনে জমা ছিল, মেজদির বই পড়ে যা শিখেছিলাম, এই সবের সঙ্গে আমার মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সমস্ত নিয়ে ছোট বই 'উপেন্দ্রকিশোর' বেরুল। তারও বেশি কিছু মুদ্রণ হয়েছে'। এই বইটিও পুরস্কৃত হয়েছিল জাতীয় স্তরে। এর পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবনীন্দ্রনাথের লেখা ও ছবির বিষয়ে তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন।। এই বক্তৃতার সঙ্গে কিছু সংযোজন করে বিশ্বভারতী থেকে 'অবনীন্দ্রনাথ' বই প্রকাশিত হয়। আার ১৯৬৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎচন্দ্র স্মৃতিবক্তৃতা দিয়েছিলেন সুকুমার রায়ের সাহিত্যরচনা বিষয়ে। এটিও গ্রন্থকারে প্রকাশ করেছিলেন মিত্র ও ঘোষ। নিজেই লিখেছেন: 'আরও অনেক তথ্য দেওয়া উচিত ছিল বলে মনে খুঁৎ খুঁৎ করে। কোনও সময়ে ওটির পুনর্লিখন করার ইচ্ছে আছে'। পরে সেই সুযোগ পান যখন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সুকুমারের জন্মশতবর্ষে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখার দায়িত্ব তাঁকে দেন। 'সুকুমার' (১৯৮৯) সম্ভবত তাঁর সেরা জীবনীগ্রন্থ। আর একটি জীবনীর হদিশ পেয়েছি সম্প্রতি গৌতম নিয়োগীর একটি লেখা থেকে। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে ব্রাহ্ম সমাজের ১৫০ বছর পুর্তি উপলক্ষে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল, যাঁরা সিদ্ধান্ত নেন যে ছোটদের জন্য একটি রামমোহনের জীবনী লেখা দরকার। সেই দায়িত্ব দেওয়া হয় লীলাকে। বইটি প্রকাশ করেছিলেন সাক্ষরতা প্রকাশনী। অতি সম্প্রতি বইটির একটি কপি সংগ্রহ করে দেখলাম যে এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৯ সালে আর এইরকম জীবনী লেখার জন্য 'বোধহয় গ্রন্থমালা' নামে একটি সিরিজ বার করার সিদ্ধান্ত হয়, সেই কমিটির সভাপতি ছিলেন ড. নীহাররঞ্জন রায় আর লীলা মজুমদার একজন সভ্য ছিলেন। আমার ধারণা এই 'রামমোহন' বইটির কথা অনেকেরই জানা নেই। এছাড়াও অবশ্য তাঁর অগ্রন্থিত লেখার মধ্যে বহু জীবনীভিত্তিক প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে।

এতক্ষণ বিশদভাবে তাঁর ছোটদের জন্য লেখাগুলি নিয়েই আলোচনা করেছি, যদিও জানি এই লেখাগুলি বড়দেরও কম প্রিয় নয়। নিজেই লিখেছেন, 'সমস্ত মন পড়ে থাকে ছোটদের জন্য লেখার দিকে। জানি ওপথে কেউ নাম পায় না, কড়ি পায় না, পুরস্কার পায় না। তবে এও জানি তাতে কিছু এসে যায় না। ঐখানেই আমার আসল কাজ'। এসব নিয়ে তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁকে কথা শোনাতেও ছাড়েননি : 'একদিন সুশোভন এসে বলেছেন, 'তোমার বোধহয় ছোটদের জন্য আজগুবি লেখা বন্ধ করতে হবে'। গিরিজাবাবু বলেছিলেন— 'ভদ্রমহিলাকে কাগজ নষ্ট করতে বারণ কর'। কিন্তু যে কামারশালায় নতুন দিনের বাংলা সাহিত্যের লোহা পিটিয়ে শক্ত করা হচ্ছিল, দূর থেকে তার একটু স্ফুলিঙ্গ দেখা ছাড়া আর কিছুর সুযোগ পাই নি'। কিন্তু মূলত শিশুসাহিত্যিক হিসেবে পরিচিতি হলেও আর তা নিয়ে নিজের জেদ ধরে রাখলেও লীলা বড়দের জন্য কম লেখেননি। প্রথম ১৯৩৯ সালে বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদনায় 'বৈশাখী' বার্ষিকীতে 'সোনালি রূপোলি' নামে একটা ছোট ভূতের গল্প প্রকাশিত হয়। তাঁর ভাষায় 'সঙ্গে সঙ্গে আমিও বড়দের গল্পলেখক হয়ে গেলাম। সম্পাদকমশাইরা কেবলি গল্প চাইতে লাগলেন। সেই থেকে আমিও আজ পর্যন্ত অজস্র বড়দের ছোট গল্প লিখেছি'। এরপর উপন্যাসের পালা মীরা চৌধুরী নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। লীলা লিখেছেন, 'আমি ওঁদের পেড়াপীড়ি এড়াতে না পেরে পর পর দুটি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখেছিলাম। 'শ্রীমতী' আর 'জোনাকি', বড়দের জন্য

প্রথম দুটি উপন্যাস, মনের খুশিতে লেখা। ওদের দুটি নিয়ম ছিল— (১) প্রধান চরিত্র হবে মেয়ে (২) তার সুখে পরিণাম হবে। নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়ম দুটি পালন করেছিলাম। তাতে তাদের সাহিত্যিক গুণ বেড়েছিল কিনা জানি না কিন্তু জনপ্রিয়তার অবধি ছিল না। এর পর আমার বড়দের উপন্যাসের চাহিদা এবং সংখ্যা দুইই সমানভাবে বেড়ে গেছিল। তবে আমি মনে মনে টের পাচ্ছিলাম যে বড়দের জন্য উপন্যাস লেখার প্রতি আমার খুব বেশি আগ্রহ নেই। আমি আবার খানিকটা দুর্বলতা না থাকলে কোনও কাজে তেমন জোর পাই না'। এরপর বেতারে কাজ করবার সময় সপ্তাহে একদিন করে 'ঠাকুমার চিঠি' প্রচারিত হয়েছিল। বিষয়টি বেশ নতুন, একজন মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ মেয়েকে ১১/১২ বছর বয়স থেকে বিয়ে হওয়া পর্যন্ত সাধারণত যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, কি ভাবে তা মোকাবিলা করা যেতে পারে', আলোচনাটি চিঠির মাধ্যমে। এটি পরে 'মণিমালা' নামে প্রকাশিত হয়। তাঁর বেতার জীবনে বড়দের লেখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মণিমালা, 'চীনে লণ্ঠন', 'ইষ্টকুটুম', 'ঝাঁপতাল', 'নাটঘর', 'লাল নীল দেশলাই' নামে গল্প সঙ্কলন এবং 'গাওনা' নামে নাটক সঙ্কলন। হয়ত এর আগেই প্রকাশিত হয়েছিল 'মণিকুন্তলা'। 'চতুরঙ্গ' পাঠকেরা লীলার পরবর্তী বক্তব্য শুনে আনন্দ পাবেন: '১৯৫৮ থেকে ১৯৬৩-র মধ্যে অনেক কিছু লিখে ফেললাম। দিনে সময় হত না, রাত জেগে লিখতাম। আমার স্বামী কিছু খুশি হতেন না। হুমায়ুন কবির তখন দিল্লীতে, কিন্তু চতুরঙ্গ বলে বড়দের জন্য সুন্দর একটি সাহিত্য পত্র প্রকাশ করতেন। যতদূর মনে পড়ে ত্রৈমাসিক। আতওয়ার রহমান বলে একজন স্বল্পায়ু সুন্দর ছেলে হাসিমুখে সব ঝামেলা নিজের কাঁধে তুলে নিতে। আমাকে বলা হল একটি ছোট ও সরস উপন্যাস লিখে দিতে। তবে বিষয়বস্তু হবে আধুনিক শহুরে সমাজ। 'চীনে লণ্ঠন' লেখা হল। বহাবাহুল্য বড়দের জন্য। পুরনো বন্ধু কানাই সরকার ত্রিবেণী বলে একটি প্রকাশনালয় করেছিলেন। সেখান থেকে বই হয়ে বেরোল'। এর পরে লিখেছেন, 'পরের বছর 'ইষ্টকুটুম' বেরোল ওখান থেকেই (ত্রিবেণী)। সেকালের ইঙ্গ বঙ্গ সমাজের নানারকম সরস ছোট গল্প। তার নায়ক নায়িকারা সকলেই আমার তথাকথিত আত্মীয়। অর্থাৎ সম্পূর্ণ মনগড়া। ... 'ইষ্টকুটুম' নাম দিয়েছিল বেতারের ঊষা ভট্টাচার্য। ...ঐ ১৯৫৮ সালেই ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি থেকে 'ঝাঁপতাল' বেরোল, একজন বঞ্চিত মেয়ের জীবনে জয়ী হবার গল্প। কিসে যে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল ভুলে গেছি। বই হয়ে বেরুতেই জনপ্রিয় হয়েছিল। পরের বছর আরেকটি বড়দের ছোটগল্প সংগ্রহ 'লাল নীল দেশলাই' প্রকাশ করলেন আর্ট ইউনিয়ন নামে এক অল্পায়ু সংস্থা। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে বইখানি উৎসর্গ করেছিলাম। বড় খুশি হয়েছিলাম। একজন নির্যাতিত নারীর পূনর্বাসনের গল্প 'নাটঘর' লিখলাম, ত্রিবেনী থেকে প্রকাশিত হল। এসব-ই বড়দের জন্য লেখা। বেতারের জন্য বেশ কয়েকটি সরস নাটক লিখেছিলাম। 'গাওনা' নামে দিয়ে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড বইটি প্রকাশ করলেন'। লক্ষণীয় যে যদিও তাঁর ছোটদের গল্পে মেয়েদের প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায় না, বড়দের প্রায় প্রতিটি গল্পেরই কেন্দ্র-বিন্দুতে আছে এক নারী এবং কাহিনিটি তাঁর একলা পথ চলার গল্প। আসলে মেয়েদের অধিকারের দিকটি তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আন্তর্জাতিক নারী বর্ষের অনুষ্ঠানে খুব উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। সে বছরই 'কথা সাহিত্য' পত্রিকায় 'যাত্রী' নামে একটি ধারাবাহিক ছোট উপন্যাস লিখেছিলেন। এছাড়াও তাঁর লেখা 'ফেরারী', 'পাখী' ও শেষ বড়দের বই 'আমি নারী' (১৯৮৮) প্রকাশ করেছিলেন মিত্র ও ঘোষ এবং প্রত্যেকটিই মেয়েদের জীবনসংগ্রামের কাহিনি। মেয়েদের অধিকার নিয়ে বহু প্রবন্ধও লিখেছিলেন। তাঁর মধ্যে The Position of Women in Modern India নামে একটি প্রবন্ধ সম্প্রতি Women and Society বইটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলায় আরও একটি প্রবন্ধ 'স্বাধীনতা লিব্ নয়' উল্লেখযোগ্য। ইষ্টকুটুম-এর মতন রসাশ্রয়ী আরেকটি বই লেখার বোধহয় ইচ্ছা ছিল, একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, 'ঠিক করেছি আর দু-একটি মাত্র বড়দের বই লিখব। একটির নাম দেব 'পাড়া কাহিনী'। এই বইটি কিন্তু তাঁর শেষ পর্যন্ত আর লেখা হয়নি।

বড়দের জন্য তাঁর ভিন্ন স্বাদের কয়েকটি বইও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে অবশ্যই আছে তাঁর আত্মজীবনীমূলক কয়েকটি লেখা। তিনি লিখেছেন, 'আমি বই না লিখলে এবং সে বই কেউ কেউ না পড়লে, কোনও সম্পাদক আমার জীবনকথা ছাপতেন না এ বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। আমিও সেই সুযোগে সারাজীবন ধরে যে হাজার হাজার লেকের কাছে নানাভাবে ঋণী, সে কথার স্বীকৃতি দেবার চেষ্টা করেছি। সকলকে মনেও করতে পারি না, সব ভুলে ভুলে যাই। হঠাৎ একটা মুখ স্মৃতিপটে জ্বলজ্বল করে ওঠে'। তাঁর প্রথম আত্মজীবনীমূলক লেখা 'আর কোনোখানে' ধারাবাহিকভাবে বোধহয় 'কথা সাহিত্যে' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। মিত্র ও ঘোষ এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন (১৩৭৪), পরের বছর বইটি রবীন্দ্রপুরস্কারও পায়। এই বইতে শিলংয়ে তাঁদের বাল্যকাল থেকে তাঁর শান্তিনিকেনে অধ্যাপনার সমস্ত সময় পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত তাঁর আত্মজীবনী 'পাকদন্ডী' ধারাবাহিকভালে অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, পরে আনন্দ পাবলিশার্স বই করেন (১৯৮৬)। 'পাকদন্ডী' নামে প্রসঙ্গে নিজেই লিখেছেন, 'অনেক জানতে চায় পাকদন্ডী নাম কেন। পাকদন্ডী হলে তো পাহাড়ের খাড়াই ওঠার জন্য সাপের মতো আঁকা বাঁকা পথ। সেই পথ-ই। ...সে পথ সোজা নয়। সোজা পথও একটা থাকত; পাকদন্ডীর বাঁক বাঁকে সে পথ খাড়া উঠে যেত। ভারি কষ্টকর, হাঁপ ধরা পথ সেটা। পাকদন্ডী সিকি ভাগ লম্বা; কাজের মানুষদের পথ। ...কিন্তু পাকদন্ডী আস্তে আস্তে, ঘুরে ঘুরে ছায়ায় ছায়ায় উঠত। ...(সেই পথ বেয়ে) পাহাড় চড়াতে কোনও কষ্ট থাকে না। একমাত্র মুস্কিল হল গন্তব্য স্থানে পৌঁছবার সময় নাও পাওয়া যেতে পারে কারণ কখন সূর্য ডোবে কে জানে, গন্তব্য স্থানের কথা ভুলে যাওয়াও বিচিত্র নয়। এই জন্য পাকদন্ডী নাম। এর বেশি কি বলব? ভালো জিনিস দেখে দেখে চলা, মন বোঝাই করে সুন্দর জিনিস জমা করা।' এত সরস আত্মজীবনী অন্য কোথাও পড়েছি বলে মনে পড়ে না। অবশ্য সব ঘটনার সত্যাসত্য হলফ করে বলা মুস্কিল কারণ তিনি নিজেই লিখেছেন, 'আমাদের কাছে কোনও গল্পই মিথ্যা নয়। যা নিত্যি ঘটে, তাও যেমন সত্যি, যা কখনও ঘটেনি কিছু একদিন ঘটে যেতেও পরে, তাও তেমনি সত্যি' অথবা 'মানুষের স্মৃতি বড় মজার জিনিস। ...একটু আধটু ভুল খুবই থাকতে পারে। হয়তো কাউকে ভুল নামে ডেকেছি। কিম্বা আগের ঘটনা পরে, পরের ঘটনা আগে দিয়েছি। বা বেমালুম বাদ দিয়ে গেছি বা উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে চাপিয়েছি'। আরও একাধিক বইতে তাঁর আত্মজীবনীমূলক লেখা ছড়িয়ে আছে। শান্তিনিকেতনে নিজের অভিজ্ঞতার ওপর লেখা 'এক বছরের গল্প' বইটি প্রকাশিত হয়েছিল চট্টগ্রাম থেকে, এপার বাংলার অনেক পাঠকই বইটি হয়ত চোখে দেখেননি। এছাড়া তাঁর 'খেরোর খাতা" বইতে তাঁর স্মৃতিচারণের সঙ্গে রম্যরচনা জড়িয়ে আছে। 'আমিও তাই', 'যে যাই বলুক' ইত্যাদি অন্য কয়েকটি বইতেও তাঁর রম্যরচনা গ্রন্থিত

হয়েছে। সব শেষে বলা উচিত তাঁর 'রান্নার বই' -এর কথা। সাধারণ পাঠক না জানলেও আমরাও বেশ জানি তিনি কীরকম রন্ধনপটিয়সী ছিলেন। 'মজার কথা হল ঐ একটা বই থেকে আমি যত রয়েলটি পাই আর সমস্ত বই একসঙ্গে জুড়েও তা পাই না।' আমি শুনেছি যে আনন্দ পাবলিশার্সের এই বইটি এখনও সমান জনপ্রিয় এবং আমার গৃহিণীকে এই বইটি ব্যবহার করে নানান সুস্বাদু রান্না করতেও দেখেছি স্বচক্ষে।

লীলা মজুমদারের সম্পূর্ণ সাহিত্যকীর্তির একটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি তাঁরই লেখা অবলম্বন করে। অবশ্যই এতে তাঁর ছোটদের লেখাগুলিই প্রাধান্য পেয়েছে কারণ তিনি নিজেই ছোটদের জন্য সাহিত্যচর্চাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। সমস্যা হল এই যে তাঁর কোনও সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জি নেই। বছর কয়েক আগে প্রথম এই কাজটি করেন 'কোরক' পত্রিকার জন্য দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, তাঁর অসম্পূর্ণ তালিকায় ১২১ টি বইয়ের কথা আছে, আমি এখন পর্যন্ত তাঁর সম্পাদিত ও অনূদিত গ্রন্থ সমেত মোট ২১৪টি বইয়ের হদিশ পেয়েছি, যদিও এ তালিকাটিও অসম্পূর্ণ এবং আমার ধারণা যে তেমন করে খুঁজলে আরও কিছু বইয়ে সন্ধান পাওয়া যাবে। কাজটি আরও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ দেখছি একই বই একগাধিক প্রকাশক প্রকাশ করেছেন, একই গল্পের সঙ্কলন একই প্রকাশ ভিন্ন নামে প্রকাশিত হয়েছে অথচ অগ্রন্থিত বিপুল ছোটগল্পের সম্ভার পড়ে আছে; এবং তাঁর অনেকগুলি বই বেরিয়েছে ১৯৯৫ সালের পরে, যখন তিনি গৃহবন্দি এবং বই প্রকাশনা সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে সম্পূর্ণ অপারগ ছিলেন। গভীর দুঃখের সঙ্গেই এই কথাটি বলতে হল কারণ সাধারণতভাবে প্রকাশকদের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য সর্বজনবিদিত। তিনি নিজেই লিখেছেন, 'যখন বেতারে ঢুকলাম, আমার বয়স ৪৮, কিন্তু প্রকাশক বলতে ঐ একজন (সিগনেট প্রেস) এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারত? দুঃখের বিষয় তাঁদের মন্দ সময় এল। প্রেমেনবাবু আমাকে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেডের জিতেনবাবুর কাছে নিয়ে গেলেন। 'হলদে পাখির পালক' দিয়ে তাঁরা আমার বই ছাপা শুরু করলেন। জিতেনবাবু অন্যত্র যাবার পর এঁদেরো ছোটদের বইয়ের কাজ একটু থিতিয়ে এল। আমাকে অন্য প্রকাশকের কথা ভাবতে হল। এইভাবে চক্রবৃদ্ধির মতো আমার প্রকাশকদের বৃত্ত বড় হতে লাগল। ১৯৬৮ থেকে মিত্র-ঘোষও আমার কিছু বই ছেপেছেন। তাঁদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সম্পর্ক। তারপর আরও নবাগতরা আছে, বিমলারঞ্জন, মৌসুমী, অন্নপূর্ণা, নাথ, শৈব্যা, নির্মল বুক এজেন্সি হয়ে গেল। ...এদের আমি ফেলি কি করে? কেউ কেউ এমনিতে হয়তো বাকি ফেলে রাখে, আমার দরকার হলেই দেয়। কেউ নিজেরা বিপদে পড়েছে, দিতে পারছে না। তবে জেনে শুনে বঞ্চিত করছে বুঝলে খুব রাগ হয়'।

তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে তাঁদের চৌরঙ্গির বাড়িটা ছিল ছোটদের স্বর্গরাজ্য, গল্প শোনা, গল্পের বই পড়া, অপূর্ব খাবারের স্বাদ আর দোতলার গাড়ি-বারান্দা থেকে ময়দানের হারিয়ে যাওয়া দৃশ্য এসব মিলেমিশে আমাদের মনে একাকার হয়ে আছে। তাঁদের শান্তিনিকেতনের বাড়িতেও অনেক ছুটি কাটিয়েছি। 'সন্দেশ' সম্পাদক হিসাবে অনেক নতুন 'সন্দেশী' লেখককে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন, এই অধমও তাদের মধ্যে একজন। আর লীলা মজুমদার আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তিনি চিরদিন আমাদের মনের মধ্যে থাকবেন তাঁর লেখার মাধ্যমে। তাঁর সম্বন্ধে কেউ লিখেছেন 'ঋজু, সাবলীল ভাষা, তাতে আগাগোড়া স্নিগ্ধ রস', কেউ লিখেছেন 'চিরকাল ছোটবেলাটা তাঁর মনের মধ্যে বেঁচে ছিল', আবার কেউ লিখেছেন 'ছোটদের জন্য এমন তিনি লিখে গেছেন যেখানে মজা আছে, ছলনা নেই। ভূত আছে, ভয় নেই। ডাকাত আছে, কিন্তু খুনোখুনি হানাহানি নেই'। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর অটোগ্রাফের খাতায় ১৯২৫ সালে লিখে দিয়েছিলেন :

'নামের আখর কেন লিখিস, নিজের সকল কাজে?
পারিস্ যদি প্রেমের আখর রাখিস জগৎ মাঝে'।

আমি নিশ্চিত যে এই প্রেমের আখর দিয়েই তিনি লিখে গেছেন তাঁর অনির্বচনীয় গল্পসম্ভার। তাঁর গল্পের উপজীব্য নিয়ে নিজেই তো লিখেছিলেন 'কি দিয়ে এসব গল্প হবে? কেন, সুখ দিয়ে, খুশি দিয়ে আর রাগ দিয়ে, ভালো দিয়ে আর মন্দ দিয়ে, যা সত্যি ঘটে তাই দিয়ে আর যা মন-গড়া তাই দিয়ে, যাকে লোকে বলে সম্ভব তাই দিয়ে আর যাকে মনে করে অসম্ভব তাকেও দিয়ে আমাদের গল্প তৈরি হয়'।

মনে করার চেষ্টা করেছিলাম তাঁর কোন গল্পটি সবচেয়ে প্রিয়। অনেক গল্পই তো মনে পড়ে : মিনু-শঙ্করের কুকুর পোষা গল্প, মনে পড়ে অঙ্ক ভুল করে গুপির সেই মারাত্মক উত্তর—পঁচিশ মিনিটের জায়গায় সাড়ে পাঁচটা বাঁদর, মনে পড়ে নোংরা জামাকাপড় পরা লোকটার 'ভানুমতীর খেল' দেখানো, হেডমাস্টার মশাইয়ের ভাইপো 'নতুন ছেলে নটবর' আর হেড কেরানিবাবুর ছেলে হরিনারায়ণের গল্প কিংবা সিঁদেল চোর শিবুর কথা। এছাড়া 'পদিপিসীর বর্মি বাক্স' তো আছেই, যেখানে পাঁচুমামা বলছে 'চুপ, চোখ ইজ জ্বলজ্বলিং', যে পাঁচুমামার গরু দেখলে হাঁটু বেঁকে গেলেও মনের মধ্যে সিংহ গর্জন করে। 'গুপির গুপ্ত খাতা'-র গুলি কেবল গাড়ি গিয়ার চিপকোচ্ছে, লোমওয়ালা প্যাবেঞ্চুস খাচ্ছে আর ভাবছে হুলিয়ারা গন্ধ শুঁকে শুঁকে এখানেও হাজির হচ্ছে নান কি? কয়েক বছর আগে দেখেছি অনীতা অগ্নিহোত্রী তাঁর ভোট দিয়েছেন 'হলদে পাখির পালক' -কে, সম্প্রতি রুশতী সেন বিস্তারিত আলোচনা করেছেন 'টং লিং' - 'মাকু' ঘরানা বইগুলি নিয়ে। কিন্তু সব দিক বিচার করে আমি শ্রদ্ধেয় অশোক মিত্রের সঙ্গে একমত, তিনি লিখেছিলেন, হ্যাঁ লীলা মজুমদারের সব রচনাই আমার সমান পছন্দ। তাহলেও সমান পছন্দের মধ্যেও একটু আরও বেশি পছন্দ সেই গল্পটি, ঘোতন হতে পারতাম, সবিনয়ে সমিনতি অনুরোধ জানাতাম : দয়া করে একবার ঘোতনের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবেন?' সেই ঘোতনের কথাই বার বার মনে পড়ে যায় ভাল নাম প্রশান্তকুমার, যে দাঁত মাজে না, তোয়ালে বাথরুমের কোনায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়, রাস্তার লোকের গায়ে কুলকুচোর জল ফেলে দেয়, যে নাকি চটি পরা ছেড়ে দিয়েছে— সেই ঘোতান তো ইস্কুল ছেড়ে অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে চাইবেই। আমি নিশ্চিত জানি সব ছোটছেলের মনে মধ্যেই এক একজন ঘোতান লুকিয়ে আছে। জীবনের বাকি ক'টা দিন সেই ঘোতানের খোঁজেই কাটিয়ে দেওয়া যেত পারে।